কেমন চাই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়

নজরুল ইসলাম

০৭ নভেম্বর ২০১৯, ১৪:৩৭
আপডেট: ০৭ নভেম্বর ২০১৯, ১৪:৪৫

আমাদের পরম সৌভাগ্য যে বঙ্গবন্ধুর মতো একজন নেতা পেয়েছিলাম। বাঙালির একমাত্র স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা তিনি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি অবশ্যই সে কারণে। তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করলেন, নতুন রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ চরিত্র নির্ধারণ করতে চাইলেন চার মূলনীতি–জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা আশ্রয় করে। ‘সোনার বাংলা’ গড়ার মানসে একসঙ্গে শুরু করলেন একাধিক সুদূরপ্রসারী কর্মযজ্ঞ। অবিশ্বাস্য রকম স্বল্প সময়ে সম্পন্নও করলেন সেসব। এক বছরের কম সময়ে রচিত ও অনুমোদিত হলো দেশের সংবিধান, দুই বছরের মধ্যে প্রকাশিত হলো অর্থনৈতিক পথনির্দেশক পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট।

বঙ্গবন্ধু দেশের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান মনীষী ড. মুহাম্মদ কুদরাত-এ-খুদাকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন জাতীয় শিক্ষা কমিশনের। শিক্ষাক্ষেত্রে সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা উপহার দিয়েছিলেন তিনি এবং তাঁর সহযোগীরা। উচ্চশিক্ষা নিয়ে সার্বিক বিশ্লেষণ ও দীর্ঘমেয়াদি সুপারিশ রেখেছিলেন তাঁরা তাঁদের রিপোর্টে। শুরুতেই চিহ্নিত করেছিলেন ‘আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষার বর্তমান পদ্ধতি নানা দিক দিয়ে ত্রুটিপূর্ণ’...‘শুধু বিভিন্ন বিষয়ের সংখ্যা সমতার দিক দিয়ে নয়, বরং মান ও গুণগত উৎকর্ষের দিক দিয়েও বর্তমান উচ্চশিক্ষাব্যবস্থা জাতির জন্য এক ভীষণ উদ্বেগের কারণ (অনুচ্ছেদ ১৩.১১, পৃ. ৮৪)।’ উচ্চশিক্ষাকে সঠিক পথ ও পদ্ধতিতে পরিচালনার জন্য ১৯৭৩ সালেই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, যারা উচ্চশিক্ষার পরিচালনায় দিকনির্দেশনা দেবেন এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করবেন।

প্রায় একই সময়ে দেশের বিদ্যমান চারটি (ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও জাহাঙ্গীরনগর) সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আইন সভায় অনুমোদন দেওয়া হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের স্বার্থে ‘বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ/আইন ১৯৭৩’। নজিরবিহীন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় উপাচার্য নির্বাচন ও নিয়োগের ব্যবস্থা রাখা হয় সে আইনে, এমনকি ছাত্র প্রতিনিধিরাও থাকবেন সে নির্বাচনপ্রক্রিয়ায় প্রত্যক্ষ ভূমিকা রক্ষাকারী হিসেবে। এই পদ্ধতিতে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কতজন আদর্শ উপাচার্য পেয়েছে বা পায়নি, এ নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ গবেষণার সুযোগ রয়েছে। আমাদের বর্তমান সংক্ষিপ্ত আলোচনা মূলত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদ নিয়ে।

১৯৭৩ থেকে ২০০৬–৩৩ বছরে দেশে নানা রকম অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটে গেছে। জাতির জনককে হত্যা করা হয়েছে, মুক্তিযুদ্ধের চার জাতীয় নেতাকে হত্যা করা হয়েছে, আরও অনেককে হত্যা করা হয়েছে, সামরিক স্বৈরশাসন কায়েম হয়েছে, তারপর আবার একধরনের গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং পাশাপাশি উচ্চশিক্ষার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। সরকারি/পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়েছে। ১৯৯২ সাল থেকে সম্পূর্ণ নতুন ধারা, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় শুরু হয়েছে এবং দ্রুত বিস্তার লাভ করেছে। ২০০৬ সালের মধ্যেই স্থাপিত হয়েছে এ রকম ৫৪টির মতো বিশ্ববিদ্যালয়। পাশাপাশি কার্যকর ছিল ২৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়। নানা জটিলতা ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে পরিচালিত হচ্ছিল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা। এমন পরিস্থিতিতে বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় মঞ্জুরি কমিশন হাতে নিল ‘স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান ফর হায়ার এডুকেশন ইন বাংলাদেশ: ২০০৬–২০২৬’ শীর্ষক একটি পর্যালোচনা প্রকল্প। এর প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় ২০০৬ সালের নভেম্বর মাসে। ইউজিসির তৎকালীন চেয়ারম্যান ড. এম আসাদুজ্জামান এতে নেতৃত্ব দেন। তাঁদের প্রতিবেদনে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগব্যবস্থার বিদ্যমান কিছু সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে তাঁরা ১৯৭৩-এর আইনের তিনটি বিকল্প সুপারিশ করলেন (পৃ. ২৫)। যেমন: (ক) সিন্ডিকেট/সিনেট/রিজেন্ট নিজেরাই সরাসরি একজনকে উপাচার্য পদে নির্বাচন ও নিয়োগ চূড়ান্ত করবে, অথবা

(খ) চ্যান্সেলর একটি জাতীয় সার্চ কমিটি গঠন করে তাদেরই উপাচার্য নিয়োগের ক্ষমতা দিতে পারবে, অথবা

(গ) একটি জাতীয় সার্চ কমিটি গঠিত হবে, তারা পাঁচটি নাম দেবে, সেখান থেকে সিনেট তিনটি নাম নির্বাচন করে চ্যান্সেলরকে দেবে। চ্যান্সেলর তাঁর পছন্দের একজনকে নিয়োগ দেবেন।

তাতেও যে কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যাবে, তেমন মনে করেননি কৌশলপত্র রচনাকারীরা। উপাচার্য পদে যোগ্য ব্যক্তি পাওয়া কঠিন। বলা হলো, এ রকম ব্যক্তি শুধু খ্যাতিমান পণ্ডিত হলেই হবে না, একজন উপাচার্যের আরও কিছু গুণ থাকতে হবে, যেমন তাঁকে কৌশলগত চিন্তায় পারদর্শী হতে হবে, পরিবর্তন ব্যবস্থাপনায় দক্ষ হতে হবে, সর্বোপরি গণব্যবস্থাপনায় (পিপল ম্যানেজমেন্ট) পরিপক্ব হতে হবে (অনুচ্ছেদ ২.৬, পৃ. ২৫)। সহজ কথায় তাঁকে ম্যানেজমেন্ট সায়েন্সে প্রশিক্ষিত হতে হবে।

সম্প্রতি বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট) সংঘটিত মর্মান্তিক আবরার হত্যাকাণ্ডের পরবর্তী পর্যায়ে উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে সোচ্চার ছিলেন আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা, শিক্ষক সমিতির সব সদস্য, এমনকি বুয়েট অ্যালামনাই সমিতির সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক ড. জামিলুর রেজা চৌধুরীও। এত কিছুর পরও উপাচার্য ড. সাইফুল ইসলাম স্বপদে বহাল রয়েছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ চারটি পাবলিক িবশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হয় ১৯৭৩-এর অধ্যাদেশের মাধ্যমে। ছবি: প্রথম আলো

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য ফারজানা ইসলাম ১৯৭৩ সালের আইন অনুযায়ী সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিকভাবে তাঁর পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং আইনানুগভাবেই দ্বিতীয় দফায় পুনর্নিযুক্ত হয়েছেন। অসামান্য একাডেমিক যোগ্যতার অধিকারী এবং অত্যন্ত নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক উপাচার্য পদে ছয় বছর দায়িত্ব পালন শেষে তিনি উন্নয়ন ও পরিবেশসংক্রান্ত বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের মহলবিশেষের বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছেন, পরে সঙ্গে কথিত দুর্নীতির অভিযোগ যুক্ত হয়েছে। উপাচার্যের পদে প্রায় ছয় বছর দুর্নীতিমুক্ত থাকা সত্ত্বেও হঠাৎ তিনি দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে যাবেন কেন? অবশ্য এ বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর আগের দুজন উপাচার্যও মহলবিশেষের বিরোধিতার মুখে ভিন্ন ভিন্ন কারণে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন এসব বিবরণ এ জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ যে বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ মোটেও কুসুমাস্তীর্ণ নয়, তা তিনি একাডেমিকভাবে যত যোগ্যই হন।

বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ২০১৭ সালে ‘স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান ফর হায়ার এডুকেশন ইন বাংলাদেশ ২০১৭-২০২১’ শীর্ষক প্রতিবেদনে উচ্চশিক্ষা বিষয়ে নানা সুপারিশ রেখেছে, যার একটি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ হলো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য একটি ‘আমব্রেলা লেজিসলেশন’ প্রণয়ন ও প্রবর্তন করা (অনুচ্ছেদ সি-১. পৃ. ৬২)। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগের ক্ষেত্রে এই কৌশলগত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সিনেট কর্তৃক প্রেরিত তিনজনের নামের প্যানেল থেকে একজনকে চ্যান্সেলর নিয়োগ দেবেন। তবে এ ক্ষেত্রে নতুনত্ব হলো, সিনেটে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক গ্র্যাজুয়েট, শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরও অংশগ্রহণ থাকবে। এ ধরনের সুপারিশ (বিশেষ করে শেষোক্ত দুই গোষ্ঠীর অংশগ্রহণ) কার্যকর করা কতটা সম্ভব বলা কঠিন। উল্লেখ্য, প্রাসঙ্গিক স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান প্রস্তুতিতে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক উপাচার্যসহ দেশের ৬৮ জন বিজ্ঞ ব্যক্তি সম্পৃক্ত ছিলেন, নেতৃত্বে ছিলেন ইউজিসির তৎকালীন চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান। আমি নিজেও একজন সদস্য ছিলাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন অধ্যাপক ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম প্রতিবেদনটির সম্পাদনা, সমন্বয় ও পরিমার্জনের (ইমপ্রুভমেন্ট) দায়িত্ব পালন করেছেন। আমি মনে করি, কৌশলপত্রের এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আরও ব্যাপকভিত্তিক আলোচনা হতে পারে।

আরেকটি বিষয় আমার খেয়াল হলো, বর্তমান মেয়াদে একই সঙ্গে নিয়োগপ্রাপ্ত সম্মানিত তিনজন জাতীয় অধ্যাপক কেউ কখনো কোনো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করেননি। দুজন অবশ্য প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বে ছিলেন। তাঁদের একজন এখনো দায়িত্বে আছেন। বাংলাদেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ সব শিক্ষকের কাছে কাঙ্ক্ষিত পদ নয়। কেন নয়, বিশ্লেষণ দাবি করে। অন্যদিকে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ অনেক অধ্যাপকের কাছেই আকর্ষণীয়, এমনকি সাবেক সরকারি উপাচার্যদেরও কারও কারও কাছে। কেন?

আমার বর্তমান রচনাটির এখানেই সমাপ্তি টানা উচিত ছিল, তবে পাদটীকার মতো একটি প্রসঙ্গ উল্লেখ করছি। উচ্চশিক্ষা বিষয়ে আলোচনায় অবশ্যই এর সংখ্যাগত ও গুণগত দিক আলোচিত হয়। সংখ্যার দিক থেকে গত ৫০ বছরে বাংলাদেশে এ ক্ষেত্রে অভাবনীয় প্রসার ঘটেছে, ১৯৭২ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল মাত্র ছয় (সব কটিই সরকারি), ২০১৯ সালে সংখ্যা সরকারি ৪৯ ও বেসরকারি ১০৫—মোট ১৫৪টি। শিক্ষার্থীসংখ্যা বেড়েছে ১৯৭২ সালের ৩১ হাজার থেকে ২০১৯ সালে প্রায় ৩৫ লাখে (জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ডিগ্রি কলেজসহ)। গুণগত মানের প্রশ্নে মন্তব্য দেওয়া কঠিন, ব্যাপকভাবে মান প্রশ্নবিদ্ধ ও বলা হয় অধোগতিমুখী, কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে, যেমন আইটি, বিজনেস স্টাডিজ, কৃষি, জীববিজ্ঞান, ফার্মাসি, পরিবেশবিজ্ঞান, প্রকৌশল, স্থাপত্য ইত্যাদিতে হয়তো তেমন হতাশাব্যঞ্জক নয়।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার সংখ্যাগত ও গুণগত মানের বিষয়ে আলোচনায় প্রায়ই জাপানের একজন কূটনীতিকের লেখা এক বইয়ে (বেস্টসেলার) পাওয়া একটি তথ্য আমার মনে পড়ে। ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত এই বইয়ে তিনি লিখেছিলেন, ‘১০০ মিলিয়ন মানুষের দেশ জাপানে এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৫০০-এর বেশি কিন্তু গ্র্যাজুয়েটদের মান এমন যে তাঁদের অনেকে পোস্টম্যানের চাকরি করেন, এমনকি কেউ কেউ রাস্তায় জুতা পলিশের কাজও করেন’ (ইচিরো কাওয়াসাকি, জাপান আনমাস্কড, চার্লস ই টাটল কোম্পানি, রুটল্যান্ড, ভরমন্ট ও টোকিও, ১৯৬৯, পৃ. ৯৯)। বইটি লেখার কারণে অবশ্য

ভদ্রলোক তাঁর রাষ্ট্রদূতের চাকরিটি হারিয়েছিলেন। জাপানেরও এমন দিন গেছে। উচ্চশিক্ষাসহ শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের ঘুরে দাঁড়াতেই হবে। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ ও ইউজিসির স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান ২০১৭ সালে সে লক্ষ্যে যথেষ্ট দিকনির্দেশনা দেওয়া আছে। তবে এগুলোর বাস্তবায়নই বড় কথা। বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার উন্নতি হোক।

অধ্যাপক নজরুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান (২০০৭-১১)